এই লেখাটি "দি ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিষ্ট" এর ষষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।

কেমন থাকেন সিজোফ্রেনিক রোগীর পরিবারের সদস্যরা

হোসনে আরা বেগম
চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানী (প্রশিক্ষণরত)

ধরা যাক পরিবারে একজন সদস্য দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ, পক্ষাঘাতগ্রস্থ। সহজে একা একা চলা ফেরা করতে পারেন না, নিজের যত্ন নিতে পারেন না, সব সময়ই তার সাথে কাউকে না কাউকে থাকতে হয়। প্রতি মুহূর্তে লক্ষ্য রাখতে হয় তার প্রয়োজনের দিকে। পরিবারের সবাই ব্যস্ত। কারো চাকুরী, কারো ব্যবসা, কারো বা পড়াশুনা। আর গৃহিনীর রয়েছে সংসারের হাজারটা ঝামেলা। এরই মধ্যে সময় বের করে অসুস্থ ব্যক্তিটির সেবা যত্ন করতে হয়। এরকম একটা পরিস্থিতিতে কখনও তারা সবাই মিলে কোথাও বেড়াতে যেতে পারে না, দাওয়াত থাকলে সবাই মিলে যাওয়া হয় না। এমনকি, বাড়ীতে যদি কোন অনুষ্ঠান থাকে সেটাও সবাই নির্ভাবনায় ও নিশ্চিন্তে পালন করতে পারে না। এতো গেল পরিবারের সদস্যদের স্বাভাবিক কাজকর্ম ও প্রতিদিনের জীবনযাত্রার গতি ব্যহত হওয়ার ব্যপার। কিন্তু দীর্ঘমেয়াদী অসুস্থ ব্যক্তিকে ঘিরে আরো অনেক সমস্যায় একটি পরিবারের সদস্যরা পরেন, যেখানে প্রথমেই আসে চিকিৎসার খরচের ব্যাপারটা। দীর্ঘদিন ধরে চিকিৎসা খরচ বহন করতে করতে পরিবারগুলো ক্লান্ত হয়ে পড়ে। তাছাড়াও আছে রোগের উন্নতির বিষয়ে দুঃশ্চিন্তা, অনিশ্চয়তা, দিনের পর দিন এক ধরণের মানসিক চাপের মধ্যে থাকা।

এতো গেল শারীরিকভাবে দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ এমন ব্যক্তির পরিবারের সদস্যদের অবস্থা। মানসিক রোগগুলোর ক্ষেত্রে এই চিত্র কেমন দাঁড়ায়? যেমন, ধরা যাক সিজোফ্রেনিয়ার ক্ষেত্রে? সিজোফ্রেনিয়া হলো এক ধরনের মানসিক রোগ যা হলে রোগী বাস্তবতা থেকে দূরে চলে যায়, সে কানে গায়েবী কথা, শব্দ শুনতে পারে, গায়েবী কিছু দেখতে পারে। অর্থাৎ যা বাস্তবে নাই এমন কিছু সে দেখতে, শুনতে, স্পর্শ পেতে, গন্ধ পেতে কিংবা স্বাদ পেতে পারে। তার মধ্যে এমন কিছু ভ্রান্ত বিশ্বাস থাকতে পারে যা সাধারণ মানুষ করে না। এসব বিশ্বাসের স্বপক্ষে সে কোন প্রমাণ দেখাতে পারে না, কিংবা প্রমাণ দেখালেও তা যথার্থ হয় না। তার কাজকর্ম, পড়াশুনা সব কিছুতেই সমস্যা দেখা দেয় এবং সে দৈনন্দিন কাজকর্ম আর আগের মতো করতে পারে না। এই রোগটা হঠাৎ করে কারো মধ্যে দেখা দিতে পারে, আবার ধীরে ধীরেও হতে পারে। কারো সিজোফ্রেনিয়া হয়েছে কিনা তা সঠিকভাবে বলতে পারেন সাইকিয়াট্রিস্ট বা মানসিক রোগের ডাক্তার। তাঁরা বিভিন্ন ঔষুধ দিয়ে থাকেন, অনেক সময় ইনজেকশনও দেন। এই ঔষুধগুলো দীর্ঘদিন ব্যবহার করে অল্প কিছু সংখ্যক রোগী সুস্থ হয়ে উঠেন, বাকীদের লক্ষণ নিয়ন্ত্রণে থাকে এবং সারাজীবন ঔষধ খেয়ে রোগ নিয়ন্ত্রণে রেখে অনেক সময় বেশ ভালো, অথবা মোটামোটি সুস্থ জীবন যাপন করতে পারেন। তাহলে দেখা যাচ্ছে, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সিজোফ্রেনিয়া জীবনব্যাপী বা Life long রোগ যা ঔষধ এবং আরো কিছু কর্মকান্ডের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়।

আমরা কি কখনো ভেবে দেখেছি কেমন থাকেন এই রোগীর পরিবারের সদস্যরা, বিশেষতঃ যিনি রোগীর দেখা-শুনার মূল দায়িত্ব পালন করেন?

দীর্ঘদিন ধরে সিজোফ্রেনিক রোগীর পরিবার, বিশেষতঃ তার যত্নকারীর বিষয়ে চিকিৎসা বিজ্ঞান তেমন কোন আগ্রহ দেখায়নি। কিন্তু ধীরে ধীরে দেখা গেল রোগীর যেহেতু দীর্ঘমেয়াদী চিকিৎসার প্রয়োজন হয়, তাদের পরিবারকে পুরো চিকিৎসা ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত না করে, অর্থাৎ পরিবারের উপর দায়িত্ব না দিয়ে কোন হাসপাতাল বা চিকিৎসা কেন্দ্রের পক্ষে এই কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া অসম্ভব এবং এতে খুব ভাল ফলাফলও পাওয়া যায় না। তাছাড়া আরেকটা বিষয় দেখা যাচ্ছিল, তা হলো এই পরিবারগুলোর সদস্যদের মানসিক ও শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পরার বিষয়টি। এ বিষয়ে পুরো বিশ্বে বর্তমানে প্রচুর গবেষণা হয়েছে। এই বিষয়ে সর্বপ্রথম গবেষণা হয় আমেরিকায় এবং গবেষণাটি করেন একদল সমাজবিজ্ঞানী ১৯৫০ সালে। এছাড়াও পরবর্তীতে এই বিষয়ে প্রচুর গবেষণা হয়েছে। এসব গবেষণায় দেখা গেছে এই পরিবারগুলো প্রচন্ড চাপের মধ্যে থাকে। দীর্ঘদিন ধরে এই ধরণের রোগীর যত্ন করতে করতে তারা এক ধরণের বোঝা (Burden) অনুভব করে। ফলে তাদের সেবার মান যায় কমে, যা রোগীর পুরো চিকিৎসা ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করে দেয়। দেখা গেছে যত্নকারীরা বিভিন্ন ধরণের মানসিক সমস্যায় ভোগেন। যেমন- অতিরিক্ত দুঃশ্চিন্তা করা, বিষন্নতা, নিদ্রাহীনতা, বেশী রাগ, বিরক্তি ভাব। এছাড়াও তাদের সামাজিক, পারিবারিক অভিযোজনেও (Adjustment) সমস্যা দেখা যায়। অন্য যে কারোর তুলনায় তারা শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন বেশী।

আমাদের দেশে এই বিষয়ে খুব বেশী কাজ হয়নি। তবে একটি গবেষণায় দেখা গেছে সিজোফ্রেনিক রোগী আছে এমন পরিবারগুলো প্রচন্ড চাপের মধ্যে থাকে এবং তারা তুলনামূলকভাবে সামাজিকভাবে বিচ্ছিন্ন জীবন-যাপন করে (রাব্বানী, ১৯৯২)। অন্য একটি গবেষণায় মোট ৫৯ জন যত্নকারীর উপর গবেষণা করে দেখা গেছে যে, বেশীরভাগ যত্নকারীই মহিলা এবং তারা তীব্র মাত্রায় চাপের মধ্যে থাকেন (বানু, ২০০১)।

যত্নকারী বা পরিবারের সদস্যদের এই অবস্থা যে শুধুমাত্র রোগীর যত্ন নেয়ার কারণে হয় তা নয়। দীর্ঘদিন ধরে চিকিৎসার যে খরচ, রোগ ও চিকিৎসা সম্পর্কে অজ্ঞতা বা ত্রুটিপূর্ণ জ্ঞান, রোগীর সাথে কিভাবে আচরণ করতে হবে, কিভাবে কঠিন পরিস্থিতিতে রোগীকে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে সে সম্পর্কে অজ্ঞতা বা ত্রুটিপূর্ণ জ্ঞান, রোগীর সুস্থ হয়ে উঠা নিয়ে যে অজ্ঞতা এবং অনিশ্চয়তা, রোগীর আচরণ নিয়ে যে অনিশ্চয়তা এবং সর্বোপরি রোগীর এবং রোগটার প্রতি যে মনোভাব সবকিছুর কারণে দেখা যায় তারা প্রচন্ড মানসিক চাপের মধ্যে থাকেন। এছাড়াও রয়েছে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর ব্যাপারটি। পরিবারে একজন পক্ষাঘাতগ্রস্থ রোগী

থাকলে সেটাকে মানুষ যে দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখে, পরিবারে একজন সিজোফ্রেনিকের মতো মানসিক রোগী থাকলে দৃষ্টিভঙ্গী হয়ে যায় একেবারেই ভিন্ন। ফলে পরিবারের সদস্যরা সামাজিকভাবে একধরনের বিচ্ছিন্ন জীবন যাপন করতে বাধ্য হন। বাইরে মেশার সময় তারা অসুস্থ ব্যক্তিটির কথা বেশীর ভাগ সময়ই গোপন করে যান। অনেকে চেষ্টা করেন রোগীর বিবাহ দেয়ার মাধ্যমে সমস্যাটার একটা সমাধান করতে। কিন্তু পরিণতিতে সমস্যা যায় আরো বেড়ে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, পরিবারের সদস্যরা তাদের সমস্যাগুলোর কথা কাউকে বলতেও পারেন না, সমাধানের কোন বাস্তবসম্মত উপায়ও খুঁজে পান না।

আমাদের দেশে বিভিন্ন হাসপাতালের মনোরোগ বিদ্যা বিভাগে সিজোফ্রেনিক রোগীর চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে, কিন্তু এই রোগীদের পরিবার বা যত্নকারীদের জন্য তেমন কোন সুযোগ নেই। প্রায়ই দেখা যায় রোগীর তুলনায় ডাক্তারের সংখ্যা অনেক কম। তাই প্রতিটি রোগীকে দেখার পাশাপাশি রোগীর যত্নকারীর সাথে বিস্তারিত কথা বলার মত সুযোগ নেই। কিন্তু পরিবারের সদস্যরা যদি রোগটি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করেন এবং রোগীর সাথে কিভাবে আচরণ করবেন এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানেন এবং সেই অনুযায়ী কাজ করেন, তবে রোগীকে দেখার পাশাপাশি তারা নিজেরাও অনেক সমস্যার সমাধান করতে পারবেন। তাছাড়া ডাক্তার যখন কিছুটা কম ব্যস্ত থাকেন তখন তাকে প্রশ্ন করে রোগটির বিভিন্ন দিক সম্পর্কে জানতে পারেন। এক্ষেত্রে একজন চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানী এবং বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে একজন মনো-সমাজকর্মী ও মানসিক রোগের সেবিকা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন। একজন চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানী রোগটি সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য সরবরাহ করার পাশাপাশি যত্নকারীর বা পরিবারের সদস্যদের হাতে-কলমে রোগীর সাথে কিভাবে আচরণ করতে হবে সে বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিতে পারেন। এছাড়াও পারিবারিক চিকিৎসা (family therapy)- এর মাধ্যমে রোগীর উপস্থিতিতে পরিবারে যেসব সমস্যা ও জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে সে বিষয়ে পরিবারকে সাহায্য করতে পারেন। সর্বোপরি যেসকল যত্নকারীরা রোগীর দেখাশুনা করতে করতে নিজেরাই প্রচন্ড মানসিক চাপে আছেন তাদেরও সেবা দিতে পারেন। সিজোফ্রেনিক রোগীর পরিবারের সদস্যরা নিজেরাও নিজেদের সাহায্য করতে পারেন। তারা নিজেরা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে পরস্পর আলোচনা করলে একে অপরকে মানসিক চাপ থেকে কিছুটা মুক্তি দিতে পারেন। এবং একই ধরণের সমস্যায় অন্য পরিবারগুলো কি করে ব্যপারটা নিয়ন্ত্রণ করেছেন, তা জেনেও তারা নিজের কর্মপন্থা ঠিক করতে পারেন। এভাবে পরিবারের সদস্যরা একে অপরকে চমৎকার মানসিক সমর্থন যোগাতে পারেন।

সর্বশেষে বলা যায়, মানসিক রোগীর যথোপযুক্ত যত্ন নিশ্চিত করতে হলে তাদের পরিবারের সদস্যদের মানসিক চাপ কমাতে হবে। এজন্য সংশ্লিষ্ট পেশাজীবীদের পাশাপাশি সরকারকেও এগিয়ে আসতে হবে।

লেখক পরিচিতি
লেখক হোসেন আরা বেগম একজন প্রশিক্ষণরত চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানী। বর্তমানে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা মনোবিজ্ঞান বিভাগে এমফিল করছেন।

একজন ব্যক্তির স্বাস্থ্য সম্পর্কিত আচরণ অনেকাংশে নির্ভর করে ঐ ব্যক্তির মানসিক স্বাস্থ্যের উপর। যেমন- মানসিক অসুস্থ্যতা, মানসিক চাপ স্বাস্থ্য সম্পর্কিত আচরণকে প্রভাবিত করে। এসব মানসিক বৈকল্যের অনেক ধরনের কার্যকরী চিকিৎসা রয়েছে। যেমন- ঔষধের মাধ্যমে চিকিৎসা, সাইকোথেরাপী, মনোসামাজিক সেবাসমূহ এবং পুনর্বাসন। [WHO, 2001]